বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ৩১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২০

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশ এবং চীনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার একটি তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ

মোস্তফা কামাল মুজেরী*

১। ভূমিকা

বর্তমান সময়ে উচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি সমষ্টিক ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্র-তগতিতে আয় দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে সফলতার একটি আন্তর্জাতিক উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। চীন বিগত পাঁচ দশকে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সকলের জন্য পুষ্টির মান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসে চিত্তাকর্ষক রেকর্ড অর্জন করেছে (দেখুন World Bank 2001, 2009; Chen and Wang 2001)। সম্ভবত চীনা জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির সফলতার সব থেকে গুর-ত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে জন্মকালীন গড় আয়ুর প্রত্যাশা বৃদ্ধি যা ১৯৫০ সালের ৩৪ বছর থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালে ৭৩ বছরে দাঁড়ায়। চীনে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি এলাকাভিত্তিক সরকারি নীতি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে ('Go West Strategy') যার আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি সংস্কার এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ধারিত তহবিল উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২০০৮-২০০৯ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তীকালে চীন প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতি গুর-ত্ব আরোপ করে যার ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সময়ে চীন একটি উঠতি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিশেষ করে নগরে বসবাসরত দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট সামাজিক নীতি গ্রহণ করে। উপরন্তু 'দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নেতৃস্থানীয় গ্র-প' (`Leading Group of Poverty Reduction') এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকার ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন করা হয় যাতে নতুন সম্ভাবনা ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবস্থাসমূহ কিন্তু ভিন্নতর ছিল। বিশ্বায়ন যদিও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুর-ত্বপূর্ণ এবং তৈরি পোশাক খাত (RMG) বর্তমানে দেশটির অর্থনীতির সবচেয়ে গতিশীল খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু আগামী দশকগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এই খাতের ভূমিকা সম্ভবত যথেষ্ট শক্তিশালী নাও থাকতে পারে। একই সময়ে পলণ্ডী উন্নয়নে সাফল্য, সামাজিক নীতি, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবুও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে চীনের ঈর্ষণীয় সফলতা বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অনেক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। এই প্রবন্ধে চীনের সফলতা এবং বিশ্বায়নের আলোকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কিভাবে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

প্রবন্ধটির কাঠামো নিম্নরূপ। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভিক আলোচনার পরবর্তীতে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ ও চীনের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন নীতির প্রভাব বাংলাদেশ ও চীনে ভিন্নতর হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো দারিদ্র্যের সামাজিক ও পরিবেশগত মাত্রার পরিবর্তন। এছাড়া এই আলোচনায় দারিদ্র্য হ্রাসে দু'দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ ও চীনের দারিদ্র্য বিমোচনের একটি তুলনামূলক আলোচনা এবং চীনের অভিজ্ঞতার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য মোকাবেলায় চীনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা এবং কিভাবে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ এবং চীনের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সামাজিক নীতি-সংশিণ্টষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয় দেশের অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পার্থক্যসমূহ নির্দেশ করা। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিগম্যতা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক বৈচিত্রতা, কাঠামোগত পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২.১। বাংলাদেশ ও চীনের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাম্প্রতিক ক্রমবিবর্তন

চীনকে আধুনিক বিশ্বায়নের একটি সফল উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হয় যা দেশটি একটি বিচক্ষণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংশিণ্টষ্টকরণ ও দেশজ সংস্কার কর্মসূচির সংমিশ্রণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উচ্চমান ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে চীনে দারিদ্র্য পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং চীন একটি উদীয়মান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকায় বৃহৎ জনসংখ্যাসহ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং বিশেষ করে ১৯৯০ সাল থেকে দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। দু'দেশের কিছু নির্বাচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচক সারণি ১-এ দেওয়া হয়েছে। এতে যদিও দেশ দুটির মধ্যে বেশ কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও চীন কিছু অভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন যেমন ক্রমাগত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সমস্যা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য। এটা লক্ষণীয় যে, উভয় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থানিক ও উলম্ব অসাম্য বৃদ্ধি করেছে, দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর আয় ভঙ্গুরতা বাড়িয়েছে এবং বেশ কিছু জলবায়ু পরিবর্তন সূচকে প্রতিকূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, এই দুইটি দেশের অর্থনীতি মৌলিকভাবে ভিন্ন। ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য ছাড়াও দু'দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যগত মিশ্র অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং নব্য উদারপন্থী সংস্কার ও বিশ্বায়নের সাথে সাথে, বিশেষ করে

১৯৯০ এর দশক থেকে, অর্থনৈতিক কর্মকাে রাষ্ট্রের ভূমিকার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ স্থিতিশীলতার উপর অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং উলেণ্ডখযোগ্য ভূমি (গ্রামীণ) সংস্কার বাস্তবায়ন এবং সম্পদ পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অক্ষমতা সম্পদ এবং আয়ের উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টি করে যা রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকাকে অনেকাংশে খর্ব করে।

অন্যদিকে চীনের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে আবদ্ধ ছিল। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, ১৯৪৯-এর বিপণ্ডবের পরে চীনে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার সাধিত হয় যা পরবর্তী নীতিসমূহকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এবং সম্পদ বণ্টনে নাটকীয় পরিবর্তন সাধন করে। যদিও পরবর্তীতে ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে (যেমন যৌথ খামারের পরিবর্তে ক্ষুদ্র কৃষকের উপর বেশি নির্ভরতা), ভূমির ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমতা পরবর্তীকালে অন্যান্য সম্পদ অর্জন ও সামাজিক গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুত একটি অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থনৈতিকৃ সাম্য সমৃদ্ধ সমাজে অর্থনৈতিক নীতিসমূহ বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে অসম সমাজে অনুরূপ নীতির তুলনায় ভিন্নতর গুণগত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এটা সত্য যে, ১৯৭৯ সাল পরবর্তী সময়ে সুদূরপ্রসারী সংস্কার সত্ত্বেও চীনে সমষ্টিক-অর্থনীতিতে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। একইভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOEs) এবং পৌর ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (TVEs) অধিকতর গুর"ত্ব রাষ্ট্রের ভূমিকা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। এছাড়া ঋণ বাজারে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের কর্তৃত্বের কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয়সাধন আর্থিকনীতি বাস্তবায়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে বাজার ভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন সত্ত্বেও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে দ্র"ত সংশোধনী কর্ম চালু করার উলেণ্ডখযোগ্য ক্ষমতা চীন সরকারের বিদ্যমান।[১] বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনীতির মধ্যে আরেকটি প্রধান পার্থক্য হলো বাংলাদেশের স্বল্প প্রবৃদ্ধির তুলনায় চীনের উলেণ্ডখযোগ্য উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। চীনের অর্থনীতি বিগত আড়াই দশক ধরে গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন একই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি তার অর্ধেকের কম হারে বৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধুমাত্র ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে প্রতি বছর ৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চীনের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে বেশি বিনিয়োগ। বিগত পঁচিশ বছরে চীনে জিডিপি'র অনুপাত হিসাবে বিনিয়োগ ৩৫ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশের মধ্যে ছিল, যার তুলনায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ ছিল ১৫ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশ। যদিও সমষ্টিক ক্রমবর্ধমান মূলধন উৎপাদন অনুপাত (ICOR) উভয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ, চীনে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ

[১] সাম্প্রতিক বিমুক্তিকরণ সত্ত্বেও চীনের আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের উলেণ্ডখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ এখনও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চারটি প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাংক অর্থনীতির লেনদেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং আর্থিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে যা ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহে সরাসরি ঋণ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দাপ্তরিক আর্থিক অফ-বাজেট এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত অধিকার এখনও চীনে সমষ্টিগত বিনিয়োগের বৃহৎ অংশ হিসেবে বিদ্যমান।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা ১৯৯০ সাল থেকে গড়ে জিডিপি'র ১৯ শতাংশের কাছাকাছি। তুলনামূলকভাবে একই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিনিয়োগ জিডিপির ২ শতাংশের কম।[২]

সারণি ১

বাংলাদেশ ও চীনের কিছু নির্বাচিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

সূচক	বাংলাদেশ				চীন			
	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক								
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, %	২.৬৮	২.১৯	১.৮২	১.৩৫	১.২৫	১.৪৭	০.৭৯	০.৫১
জনসংখ্যার ঘনত্ব, প্রতি বর্গ কিলোমিটার	৬৯৪	৮৮৮	১০৮১	১২৬৩	১০৫	১২২	১৩৫	১৪৪
কর্মক্ষম জনসংখ্যা %	৯৩	৮৫	৬৭	-	৬৭	৫১	৪৮	-
শহরবাসী জনসংখ্যা %	১৫	২০	২৪	-	২০	২৭	৩৬	-
অর্থনৈতিক								
বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার %	০.৮	৫.৯	৫.৯	৫.৮	৭.৮	৩.৮	৮.৪	১০.৩
মাথাপিছু জিডিপি, স্থির ২০০০ $	২২৬	২৫৫	৩৩৫	৫০৪	১৮৬	৩৯২	৯৪৯	২৪২৩
কৃষি জমি, মোট জমির %	৭৫	৭৭	৭০	-	৪৭	৫৭	৫৭	-
কৃষি মূল্য সংযোজন, % জিডিপি	৩২	৩০	২৬	-	৩০	২৭	১৫	-
শিল্প মূল্য সংযোজন % জিডিপি	২৯	২২	২৫	-	৪৮	৪৯	৪৬	-
জিডিপি'তে রপ্তানির অনুপাত %	৬	৬	১৪	-	১১	১৬	২৩	-
জিডিপি'তে মোট বিনিয়োগ অনুপাত %	১৪	১৭	২৩	-	৩৫	৩৬	৩৫	-
সামাজিক								
জন্মের সময় গড় আয়ু, বছর	৪৮	৫৪	৬১	-	৬৬	৬৮	৭১	-
মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় $	-	-	৯	-	-	-	১৪	-
উন্নত স্যানিটেশন, জনসংখ্যার %	-	৩৯	৪৬	-	-	৪১	৪৯	-
উন্নত পানির উৎস, জনসংখ্যার %	-	৭৮	৭৯	-	-	৬৭	৮০	-
মহিলা শ্রম শক্তি, মোট %	৩৭	৪০	৩৮	-	৪৩	৪৫	৪৫	-
প্রসবকালীন মৃত্যুর জীবনব্যাপী ঝুঁকি %	-	৪.১৮	১.৭১	-	-	০.৩১	০.১১	-

উৎস: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক।

চীনে কাঠামোগত পরিবর্তন প্রাথমিক (কৃষি) খাত থেকে মাধ্যমিক (শিল্প) খাতে উৎপাদন রূপান্তরের ক্ল্যাসিকাল ধারা অনুসরণ করেছে। বিগত ২৫ বছরে মোট কর্মসংস্থানের অনুপাত হিসেবে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হয়েছে এবং শিল্পখাতে উৎপাদন ও জিডিপি'র অনুপাত তিনগুণ হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পরিবর্তন হয়েছে প্রধানত কৃষি থেকে সেবা খাতে। জিডিপি'তে কৃষির অবদান গত দুই দশকে ৬০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে কমেছে কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৫০ শতাংশে অব্যাহত রয়েছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমশক্তির জন্য কম উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত প্রদান করে। উপরন্তু সেবাখাতে কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে প্রধানত অল্প মূল্য সংযোজনক্ষম কর্মকাে যা মূলত স্বল্প উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্য নীতি ও বাণিজ্যের কাঠামো ক্ষেত্রেও এই দুই দেশের মধ্যে গুর ত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। চীনের রপ্তানি বৃদ্ধি উলেণ্টখযোগ্য যার

[২] অনেক সময় এই যুক্তি প্রদান করা হয় যে, বৃহৎ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) এর অন্তঃপ্রবাহের কারণে চীনে উচ্চ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সাল থেকে পুঁজিবাজারে জিডিপি'র মাত্র ৩-৫ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ ছিল যা শুধুমাত্র শিখর সময়ে ৮ শতাংশে পৌছায়। ২০০০-২০০৭ সময়কালে চীনে সার্বিক বিনিয়োগের মাত্র ৬ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ থেকে এসেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশি পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বিনিয়োগের তুলনায় বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে বেশি ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ফলে বিশ্ব বাজারে চীনের রপ্তানি পণ্যের শেয়ার দ্র"ত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সস্তা শ্রম এবং ভর্তুকিতে প্রদত্ত পরিসেবা প্রাপ্তি রপ্তানিখাতে মূলধন প্রাপ্তিতে উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।[৩]

অন্যদিকে বাংলাদেশে সস্তা শ্রমের লভ্যতা প্রধানত স্বল্প মজুরির কারণে। এক্ষেত্রে সরকারি সুবিধা প্রদান এবং সচেতন সরকারি নীতির মাধ্যমে শ্রম ব্যয় কমানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্যতা অনেকাংশে অনুপস্থিত। এজন্য রপ্তানিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। তদুপরি চীন বাণিজ্য উদারীকরণের পদক্ষেপসমূহের গতি ও প্রকৃতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় যাতে শিল্প সংস্কারের কারণে কর্মসংস্থান সংকুচিত না হয় এবং সামাজিক ক্ষতি হ্রাস পায়।

প্রবৃদ্ধির ধরনের কারণে উভয় অর্থনীতিতেই অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে চীনে স্থানিক অসাম্য প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আর বাংলাদেশে উলম্ব অসাম্য এবং গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে বৈষম্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনে বৈষম্য দূরীকরণের নীতিমালায় বেশ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যেমন কর হারের পরিবর্তন, পশ্চিম ও অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহে অধিকতর সরকারি বিনিয়োগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাস। অপরদিকে বাংলাদেশে অসাম্য হ্রাস এখনও নীতি এজেন্ডার মধ্যে উচ্চ অগ্রাধিকার পায়নি।

উপরিউক্ত এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্বেও, উভয় দেশই ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। কোনো সন্দেহ নেই যে, চীন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বর্তমান মডেলের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। চীনের উচ্চ পুঁজি পুঞ্জিকরণ-উচ্চ রপ্তানি (high accumulation-high export) মডেল সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী আর্থিক এবং অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যেই চীনা অর্থনীতিতে কিছু বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। একইভাবে বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য অধিক টেকসই চালিকা শক্তি চিহ্নিত করা এখনও সম্ভবপর হয়নি। তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতের দেশের শ্রমশক্তিকে উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মকা"ে রূপান্তরের ক্ষমতা সীমিত বলেই মনে হয় যার মাধ্যমে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

অবশ্যই চীন ও বাংলাদেশ উভয়ের জন্যই অর্থনীতির উপর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার উন্নত ক্ষমতা সম্পন্ন এবং কৃষি অর্থনীতির দ্র"ত বিকাশ সহায়ক আরও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োজন। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য অবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় দেশের জন্য একটি অতীব গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দ্র"ত বিকাশমান জনশক্তির জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২.২। বাংলাদেশ ও চীনের পলণ্ডী উন্নয়ন নীতির বৈশিষ্ট্য

চীনের গ্রামীণ এলাকার সংস্কার-পরবর্তী সময়ের তথ্যাবলী থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকা"ে খামার পরিবারগুলোর আয় ও ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল (দেখুন Ravallion 2002, 2009)। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে চীনে গৃহীত কৌশলসমূহ দরিদ্র

[৩] যেমন শহর নিবন্ধিত অধিবাসীদের জন্য ভর্তুকিতে বাসস্থান সুবিধা, খাদ্য, পরিবহন সেবা ইত্যাদি মৌলিক পণ্য প্রদানের রাষ্ট্রীয় বিধান নিয়োগকারীদের শ্রম খরচ অনেকটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

এলাকায় প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক অনুপ্রাণনা সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় আরও ব্যাপক আয় সৃষ্টির বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে। চীনের এই সাফল্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্র এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুর"ত্বপূর্ণ। এই ধরনের কর্মসূচিতে অবশ্যই কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থাকতে হবে কারণ কৃষি চীন ও বাংলাদেশের মতো দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মৌলিক বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টিকারী (externality-generating) খাত। এই ধরনের কর্মসূচিতে স্থানীয় মানবসম্পদ ও অন্যান্য অবকাঠামোর লভ্যতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বিস্তারিত নক্শা প্রণয়ন গুর"ত্বপূর্ণ ।

চীন এবং বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকের সামগ্রিক ও কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান (চিত্র ১ ও ২)। আগেই বলা হয়েছে, চীন ১৯৮০ সাল থেকে তিন দশক ধরে উচ্চ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, যার বাৎসরিক গড় ১৯৮০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছিল ১০ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৭ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি চীনের প্রবৃদ্ধির মতো উচ্চ মাত্রায় এখনও পৌঁছায়নি, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক গতিধারায় স্পষ্ট ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যার বাৎসরিক গড় ২০০০-২০১০ সময়ে ৫.৮ শতাংশ ছিল।

চিত্র ১: বাংলাদেশে জিডিপি এবং কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি, ১৯৮০-২০১০

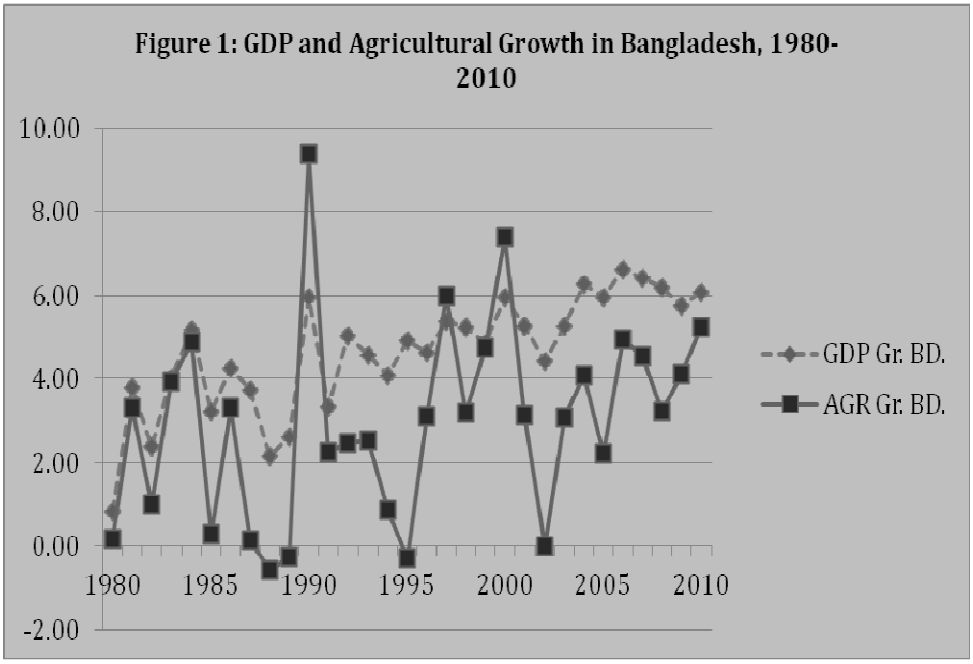

চিত্র থেকে এটাও দেখা যায় যে, এই সময়ে চীনে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল এবং এর বাৎসরিক পরিবর্তনও বাংলাদেশের তুলনায় কম ছিল। এছাড়াও দুই দেশেই সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির আপেক্ষিক গুর"ত্ব ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে চীনে।

জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান চীনে ১৯৮০ সালের ৩০ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালে ১১ শতাংশে হ্রাস পায় আর বাংলাদেশে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৯৮০ সালে ৩১ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ১৮ শতাংশ (World Bank 2009)। কিন্তু চীনে মোট কর্মী সংখ্যার ৪৪ শতাংশ এখনও কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে, যা বাংলাদেশে আরও অনেক বেশি। এ থেকে দেখা যায়, কৃষিখাত বাংলাদেশ এবং চীন উভয় দেশেই জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জন্য জীবিকা প্রদানে ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে।

প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কৃষিখাতের গুর"ত্ব বাংলাদেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পলণ্ডী এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষি কর্মকা"ের উপর নির্ভরশীল। পলণ্ডী উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে কৃষি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও অকৃষি খাতের যথাযথ বিকাশ, সামাজিক সেবাখাতসমূহের মান উন্নয়ন, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক ও কার্যকর ভূমিকা সুনিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো বিস্তৃতির উপর জোর প্রদান করা হয়।

চিত্র ২: চীনে জিডিপি এবং কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি, ১৯৮০-২০১০

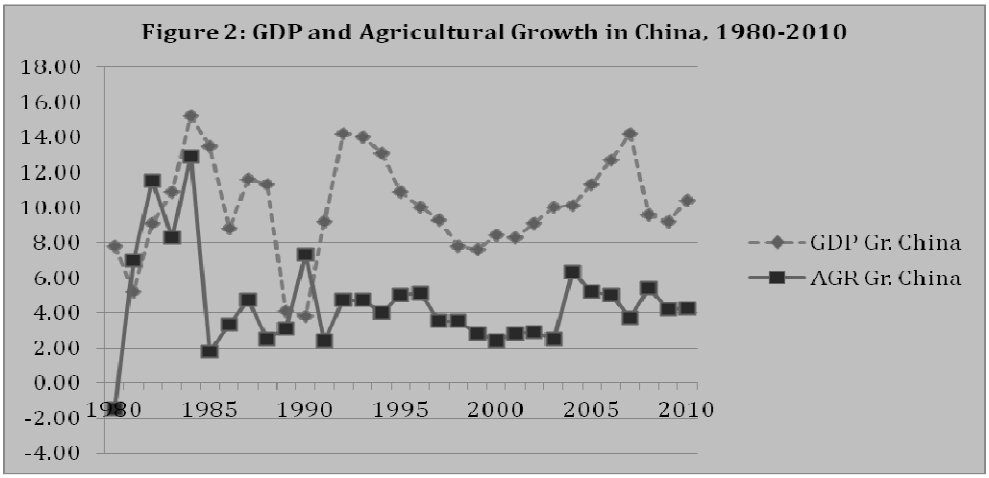

অন্যদিকে, ১৯৭৮ সাল থেকে অনুসৃত চীনের পলণ্ডী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের নীতিসমূহ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

- পর্যায় ১ : পলণ্ডী সংস্কার, ১৯৭৮-১৯৮৫
- পর্যায় ২ : জাতীয় লক্ষ্যে দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি, ১৯৮৬-১৯৯৩
- পর্যায় ৩ : ৮-৭ পরিকল্পনা, ১৯৯৪-২০০০
- পর্যায় ৪ : নতুন শতাব্দীর পলণ্ডী দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা, ২০০১-২০১০

১৯৭৮ সালের সংস্কার পরবর্তী সময়কালে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে চীনের পলণ্ডী এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার চালু এবং বণ্টন ব্যবস্থা ও সংগ্রহ মূল্য যথাযথকরণ। অবশ্য

মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মধ্যে ছিল গ্রামীণ চীনে ভূমি সংস্কার, যার মূলে ছিল পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা (household responsibility system)। এই ধরনের প্রাথমিক গ্রামীণ সংস্কার আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অসাধারণ ফলাফল প্রদান করে।[৪]

জাতীয়ভাবে লক্ষ্যভুক্ত দারিদ্র্য হ্রাসের কার্যক্রম মধ্য আশির দশক থেকে শুর" হয় যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী, বিস্তৃত উদ্যোগ এবং ভিন্ন ভিন্ন তহবিল প্রাপ্যতা। স্টেট কাউন্সিলের 'দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নেতৃস্থানীয় দল' (এলজিপিআর) ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। সরকারিভাবে ঘোষিত "দরিদ্র কাউন্টি" সমূহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করে যার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (FFW) এবং দরিদ্র এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে তহবিল প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। স্থানীয় পর্যায়ে, অধিকাংশ দরিদ্র প্রদেশ, প্রিফেকচার (prefectures) এবং কাউন্টি (counties)'তে 'নেতৃস্থানীয় দল' গঠন করা হয় এবং স্থানীয় সরকারকে তহবিল প্রদানের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে এবং কৃষি থেকে মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়, কৃষি মূল্যের আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস পায়, এবং আশির দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে গ্রামীণ-শহর এলাকার বাণিজ্য-শর্তের অবনতি ঘটে। ১৯৯৪ সালে দৈনিক এক ডলারের পরিমাপে দারিদ্র্য ১৮ শতাংশ ছিল এবং সরকারি দারিদ্র্যসীমার পরিমাপে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৮০ মিলিয়ন দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, যা ১৯৮৫ সালের তুলনায় ৪৫ মিলিয়ন কম।

১৯৯৪ সালে চীন সরকার দারিদ্র্য হ্রাস নীতিকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে '৮-৭ পরিকল্পনা' (দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা) চালু করে। '৮-৭ পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্র কাউন্টি নির্বাচনের মানদ"কে আরও বেশি শক্তিশালী করা হয় এবং 'দারিদ্র্য বিমোচন দায়িত্ব ব্যবস্থা' কাঠামোর আওতায় কার্যাবলীর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপর জোর দেওয়া হয়। '৮-৭ পরিকল্পনায়' ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত তিনটি চ্যানেল ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো: ভর্তুকি ঋণ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং সরকারি বাজেট অনুদান। ভর্তুকি ঋণ কর্মসূচির আওতায় তহবিল সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা হয় যার অর্থসংস্থান প্রধানত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়। '৮-৭ পরিকল্পনা' দারিদ্র্য বিমোচনের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল যা বিশেষ করে মনোনিত দরিদ্র কাউন্টিগুলোতে বেশি দৃশ্যমান হয়। ফলে সরকারি দারিদ্র্য সীমার পরিমাপ অনুযায়ী গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন থেকে ৩২ মিলিয়নে হ্রাস পায়।[৫] এই সময়কালে দ্র"ততর দারিদ্র্য বিমোচন প্রধানত চারটি প্রধান মাধ্যম থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়: (১) উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; (২) কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যা ১৯৯৪-

[৪] এর ফলে শস্য ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ শিল্পের শক্তিশালী বিকাশের কারণে বছরে ১৫ শতাংশ হারে প্রকৃত গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ আয়ের বৃদ্ধি এমনকি অত্যন্ত দারিদ্র্য জর্জরিত অঞ্চলসহ সর্বত্র দারিদ্র্য হ্রাস করে (উদাহরণস্বরূপ, Huanghuaihai region in Eastern Fussian)। ১৯৮১ এবং ১৯৮৪ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্য দিনে ১ ডলারের হিসাবে ৪৯ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে হ্রাস পায়, এবং সরকারি দারিদ্র্যসীমার হিসেবে ১৯৭৮ সালে গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা ২৫০ মিলিয়ন থেকে ১৯৮৫ সালে ১২৫ মিলিয়নে হ্রাস পায়।

[৫] দৈনিক ১ ডলার আয়ের পরিমাপ হিসেবে দারিদ্র্যের মোট সংখ্যা ১৯৯৩ সালে ২৬৬ মিলিয়ন থেকে ২০০০ সালে ১১১ মিলিয়নে কমে আসে, যা দৈনিক ডলার ব্যয় পরিমাপে ৩৪৪ মিলিয়ন থেকে ১৯৫ মিলিয়নে হ্রাসের সমপরিমাণ। দৈনিক ১ ডলার আয়ের পরিমাপ এবং দৈনিক ১ ডলার ব্যয়ের পরিমাপের মধ্যে এই পার্থক্য দেখায় যে, গ্রামীণ পরিবার সম্ভবত স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষাসহ প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সঞ্চয় করে থাকে।

১৯৯৫ সালের কৃষি পণ্য সংগ্রহ মূল্য সংস্কার এর সাথে সম্পর্কিত যা গ্রামীণ প্রবৃদ্ধিকে জোরদার করে; (৩) গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে অভিবাসন; এবং (৪) দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা।

১৯৯০-এর দশকে চীনে মানব উন্নয়ন দ্রুতগতিতে সম্ভবপর হয়। ২০০১ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮৫ শতাংশ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ৯৯ শতাংশ, জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৮৯ শতাংশ এবং সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৪৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৮০-২০০১ সময়কালে ১৫-৬৪ বৎসর বয়স গ্রুপে গড় বিদ্যালয় গমনের সময় ৫ বছর থেকে ৮ বছরে বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতের সূচকেও ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। জন্মকালীন গড় আয়ু ৭০ বছরে পৌঁছায়, শিশু মৃত্যুর হার ৩.১ শতাংশে নেমে আসে এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৩.৯ শতাংশে হ্রাস পায়। এ ছাড়াও প্রায় ৮৫ শতাংশের কাছাকাছি জনগোষ্ঠী অপরিহার্য ঔষধের অধিগম্যতা অর্জন করে এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনসংখ্যার হার ১০ শতাংশেরও কমে নেমে আসে। অবশ্য এসকল উন্নতি সত্ত্বেও গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল এবং উপকূল ও অভ্যন্তরীণ এলাকার মধ্যে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য ব্যাপকতর হয়।

এটা এখন স্বীকৃত হয়েছে যে. '৮-৭ পরিকল্পনায়' দারিদ্র্য বিমোচনের প্রভাব আরও বেশি সুসংহত করার সম্ভাবনা ছিল যদি সরকারি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন, আরও উন্নত টার্গেটিং ব্যবস্থা ব্যবহার এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক অংশগ্রহণমূলক পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হতো। এছাড়া এটিও দেখা যায় যে, একই কর্মসূচিতে একাধিক লক্ষ্য ব্যবহার (যেমন ভর্তুকি ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকার ও প্রবৃদ্ধি অর্জন) কখনও কখনও স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে মতদ্বৈততার সৃষ্টি করে। এছাড়া উন্নত টার্গেটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল দরিদ্র গ্রাম (বা শহর) এলাকা বিবেচনা করা এবং নির্দিষ্ট পরিবার ভিত্তিক টাগেটিং-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা বিবেচিত দরিদ্র এলাকার বাইরে অবস্থান করে তাদেরকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। একইভাবে আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কর্মসূচি নির্ধারণ, কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

'৮-৭ পরিকল্পনা'র অভিজ্ঞতার আলোকে চীন ২০০১-২০১০ সালের জন্য একটি 'নতুন শতাব্দীর দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা' গ্রহণ করে যেখানে টার্গেটিং এর জন্য দরিদ্র কাউন্টির পরিবর্তে দরিদ্র গ্রাম নির্বাচিত করা হয়। এই পরিকল্পনায় মানব সম্পদ ও দরিদ্র এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়া গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া চীনের পলণ্ডী দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার (২০০১-২০১০) ঘোষণা করা হয় ২০০১ সালে। এই পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং গ্রাম ভিত্তিক ব্যাপক উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। এটিও স্বীকার করা হয় যে, পলণ্ডী এলাকা থেকে শহরে অভিবাসন (migration) চীনের দারিদ্র্য বিমোচনের একটি বিশেষ সম্ভাবনাময় পথ এবং এক্ষেত্রে নতুন নীতি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে শহর এলাকায় উদ্ভূত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য হয়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীন সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন কনফারেন্সের আয়োজন করে যাতে ৮-৭ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব জোরদার করা এবং "প্রদেশের নিকট চার ক্ষমতা" অর্থাৎ প্রদেশের কাছে তহবিল প্রদান, ক্ষমতা প্রদান, কর্মকাণ্ড প্রদান ও দায়িত্ব প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। নতুন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুর"ত্ব আরোপ করা হয় (Gao 2001)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চীন বিগত দশকগুলোতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সংস্কারের নানাবিধ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে। এর ফলে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় বিশেষ করে দ্র"ত ও একটানা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পলণ্টী এলাকার দরিদ্র জনগণের সংখ্যা ১৯৭৮ সালে ২৫০ মিলিয়ন থেকে ২০০০ সালে ৩২ মিলিয়নে হ্রাস পায়। দৈনিক ১ ডলার ভিত্তিক দারিদ্র্যসীমাকে ব্যবহার করলে দেখা যায়, দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ১৯৯০ সালে ৩১.৩ শতাংশ থেকে ১৯৯৮ সালে ১১.৫ শতাংশে কমে এসেছে (World Bank 2001)। ১৯৭৯ সালের পরবর্তী দুই দশকে গ্রামীণ দারিদ্র্যের সামগ্রিক হ্রাস মূলত দুটি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে সীমাবদ্ধ ছিল: সংস্কার সময়কালীন প্রথম পাঁচ বছর এবং ১৯৯০-এর দশকের মধ্য তিন বছর। এই সময়কালে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ের সমষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সামগ্রিকভাবে দরিদ্র-বান্ধব ছিল। অন্যান্য বছরগুলোতে দ্র"ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচির প্রসার সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উলেণ্টখযোগ্য সফলতা লক্ষ করা যায় না।

উপরোক্ত প্রথম সময়সীমাকে সংস্কার ও পরিবর্তনের সময় হিসেবে গণ্য করা যায়, যা বিশেষভাবে পলণ্টী অঞ্চলের সংস্কারে দৃষ্টিবদ্ধ ছিল। এই বছরগুলোতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যৌথ কম্যুনগুলো (communes) ভেঙ্গে ফেলা হয়, ভূমি সমানাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারের নিকট প্রদান করা হয়, কৃষকদেরকে পূববর্তী 'শস্য প্রথম' (grain first) নীতি পরিত্যাগ করে উৎপাদন বহুমুখীকরণে উৎসাহিত করা হয় এবং খামার মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়। উপরন্ড় এই সময়ে রাসায়নিক সারের সরবরাহ দ্র"ততার সাথে বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের উৎপাদন উদ্দীপক এবং কৃষি উপকরণের ঊর্ধ্বগামী সরবরাহ নীতির সমন্বয় এক অভূতপূর্ব খামার উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির সূচনা করে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্র"ত বিমোচনের দ্বিতীয় সময়ে, যা ১৯৯০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে, চীনের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত মাথাপিছু আয় ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এসময়ে দারিদ্র্য বিমোচন অত্যন্ত আয় স্থিতিস্থাপক প্রমাণিত হয় অর্থাৎ গ্রামীণ আয়ের ২১ শতাংশ বৃদ্ধি গ্রামীণ দারিদ্র্যে ৪০ শতাংশ হ্রাস আনতে সক্ষম হয়।

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দারিদ্র্যের দ্র"ত হ্রাসের এই উভয় সময়ে একটি গুর"ত্বপূর্ণ সার্বজনীন নিয়ামক ছিল: কৃষি পণ্যের মূল্য এবং কৃষি ও শিল্প পণ্যের বাণিজ্য শর্তের দ্র"ত বৃদ্ধি। চীনে হ্রাসমুখী গ্রামীণ দারিদ্র্যের সাথে ঊর্ধ্বমুখী আপেক্ষিক কৃষিপণ্য মূল্যের এই সহযোগ সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির গুর"ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরন্তু কৃষি ও খামার উৎপাদন, জীবিকা ও দরিদ্র এলাকার উন্নয়নের প্রতি দৃঢ় আস্থা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি অগ্রাধিকার এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ চীনে গ্রামীণ উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। এ নীতিগুলোকে সহায়তা প্রদান করে অভিবাসন এবং অনগ্রসর এলাকা থেকে স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন নীতির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর বহু এলাকায় বৃহৎ অবকাঠামো বিনিয়োগ এইসব এলাকার উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (যেমন ২০০০ সালের প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত বৃহৎ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের কৌশল)। সংক্ষেপে বলা যায়, চীনে গ্রামীণ

উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা হয় যেগুলোর আপেক্ষিক অগ্রাধিকার সময় ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

প্রথমত: ব্যবহৃত কৌশলে আঞ্চলিক দারিদ্র্য (যেমন দরিদ্র কাউন্টিসমূহ) টার্গেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক ধারণা ছিল দরিদ্র কাউন্টিসমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব, ত্রাণ সরবরাহের মাধ্যমে নয়।

তৃতীয়ত, ব্যবহৃত প্রধান ব্যবস্থা ছিল আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি। প্রত্যাশা ছিল যে, আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। উপরোক্ত কাঠামোর মধ্যে বেশ কিছু নীতি ও ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় যা আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে :

- ভর্তুকি ঋণ কর্মসূচি

এই কর্মসূচির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তহবিল সঙ্কট বিদ্যমান এবং সাধারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অধিগম্যতা সীমাবদ্ধ।

- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

দরিদ্র অঞ্চলে অনুন্নত অবকাঠামো দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা। অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির অধীনে দরিদ্র এলাকায় শ্রমশক্তি ব্যবহার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে অবকাঠামো উন্নয়নের সংমিশ্রণ করে।

- উন্নয়ন তহবিল কর্মসূচি

এই কর্মসূচি দরিদ্র এলাকার বাজেট স্বল্পতা সমস্যা মোকাবিলা করে। এই কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের বাজেট ভর্তুকি দেয়া হয়। প্রথমটি হচ্ছে নির্ধারিত সরকারি সহায়তা যা দরিদ্র এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যয়ের সঙ্কুলানে সহায়ক হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে "উন্নয়ন তহবিল" যা দরিদ্র এলাকাগুলোতে উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতগুলো হচ্ছে ফসল উৎপাদন, পশুপালন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। এছাড়াও যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তাহলো অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ ও সেচ উন্নয়ন, এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির প্রসার, ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষক ও জনশক্তিকে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা। এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন আয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে।

- সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি খাত থেকে পুঁজি আহরণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে দারিদ্র্য বিমোচনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সরকারের অক্রিয়ামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত কর্মকা" এবং সামাজিক দল ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) নানাবিধ প্রচেষ্টা। এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনা নিয়ে আসে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাদির নানাবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের গ্রামীণ উন্নয়ন নীতির দুটি বিষয়ে সর্তক বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা ও সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, যার ফলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির বাস্তবতা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ প্রাপ্যতার মধ্যে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব।

২.৩। বিশ্বায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন

বিশ্বায়ন প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও পুঁজি প্রবাহের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি ও সমাজের মধ্যে একীকরণ (integration) আনয়ন করে। উৎপাদনের একীকরণ, আন্তঃরাষ্ট্র বিনিয়োগ এবং অধিকতর বাণিজ্য এই প্রক্রিয়ার যৌক্তিক ফলাফল। এটি একটি প্রক্রিয়া যা ভোগ্যপণ্য, আদর্শ ও অনুশীলন, বাজার, প্রযুক্তি, আয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করে। বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ গার্হস্থ্য বিনিয়োগে উদ্দীপনা, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারে।

অন্যদিকে বিশ্বায়ন বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ আনয়ন করে। আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারের সঙ্গে সংশিণ্টষ্টতা অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারে বৃহৎ উদ্বায়ীতা (volalility) আনতে পারে। একইভাবে বাণিজ্য উদারীকরণ অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমাতে পারে, যা প্রকৃত আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষতি সাধন করে (Khondker and Mujeri 2006; Khondker, Mujeri and Raihan 2008)। এসবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়।

সংস্কার পরবর্তী সময়ে চীন দ্র"তগতিতে তার অর্থনীতির বাধাসমূহ দূর করে এবং ২০০২ সালের মধ্যে দেশটি পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম বাণিজ্যকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৪ সালের মধ্যে জিডিপি'তে বাণিজ্যের অংশ ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পায় এবং একই বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০.৬ বিলিয়ন ডলার। চীনের রপ্তানি বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করেছিল বিদেশি পুঁজির স্থানান্তরের উপর যা সস্তা শ্রম ছাড়াও উন্নত ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত অবকাঠামো দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল উচ্চ অবকাঠামো বিনিয়োগের ফলে। এছাড়াও ভর্তুকিতে প্রাপ্ত মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম দ্রব্য ও সেবা যেমন আবাসন, খাদ্য ও নিবন্ধনকৃত নগরে বসবাসকারীদের জন্য যানবাহন সুবিধা নিয়োগকারীদের শ্রমখরচ হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এধরনের দ্র"ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উলেণ্টখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অবশ্য এটা উলেণ্টখ করা যায় যে, চীন

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম বাণিজ্য উদারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে চীনে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষ করে মধ্য নব্বই দশক পর্যন্ত। অন্যদিকে চীনে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত শহুরে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে অসমতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। এর ফলে সরকারের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য তহবিল বৃদ্ধির ক্ষমতাও কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা হলো চীনা অর্থনীতিতে 'পুন:ভারসাম্য' অর্জন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে দেশটির সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন সাধন। এরজন্য একটি প্রধান অস্ত্র হচ্ছে চীনের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও রপ্তানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশীয় ভোগ ও সেবার সঙ্গে উৎপাদনকে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ করা। এছাড়াও চীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্বায়নের উপর অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করেছে যাতে বিদেশি যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবতর কৌশল গ্রহণ করা সহজতর হয়।

অপরপক্ষে মধ্য আশির দশকে দ্বিধান্বিত আরম্ভের পরে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ কিছুটা সবল পদক্ষেপে বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। বাণিজ্য উদারীকরণ এবং রপ্তানি উদ্দীপক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও বেশি উন্মুক্ত হয়েছে। আশির দশকে জিডিপি'তে আমদানি ও রপ্তানির অংশ মোটামুটি ২০ শতাংশে অপরিবর্তনশীল ছিল, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। শ্রমিকের অভিবাসন এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের (remittances) পরিমাণ দ্রুত গতিতে বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে রিমিট্যান্স থেকে প্রাপ্ত আয় নীট রপ্তানি আয়ের তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করেছে। তবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব একটা উলেণ্ডখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি (যার পরিমাণ জিডিপি'র ০.৩-০.৪ শতাংশের মতো)।

আমরা পূর্বেই উলেণ্ডখ করেছি, আশির দশকের তুলনায় ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই সময়ে শহুরে ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলেই আয় বৈষম্যেরও প্রসার ঘটেছে। এই সময়কার তথ্য বিশেণ্ডষণ করে দেখা যায় নব্বই'র দশকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (incremental) প্রবৃদ্ধিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রায় সমান (প্রতিটি খাত ৪১ শতাংশ করে), অন্যদিকে কৃষি খাতের অবদান ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ (Osmani 2005)। এছাড়াও দেখা যায়, নব্বই'র দশকের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রবৃদ্ধির অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ অ-বাণিজ্য (nontradable) খাতসমূহ থেকে উৎপাদিত, বিশেষ করে সেবা, নির্মাণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। কাজেই এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, উক্ত সময়ে প্রবৃদ্ধির একটা বড় অংশই অ-বাণিজ্য খাতসমূহের বর্ধিত চাহিদা উদ্দীপনা থেকে এসেছে। এসময়ের প্রবৃদ্ধির তিনটি মূল উৎস হচ্ছে: (ক) শস্য উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি; (খ) তৈরি পোশাক শিল্প থেকে উৎপন্ন আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি; এবং (গ) বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের ত্বরিত প্রবৃদ্ধি (Osmani 2005)।

১৯৯০ সাল থেকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। মোট মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পে মজুরির অংশ বেশি (৩৫ শতাংশ যা অন্যান্য বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১৩ শতাংশ)। এই সংযোজিত আয়ের একটা বড় অংশই মহিলা শ্রমিক ও গ্রামীণ পরিবারগুলো কর্তৃক অ-বাণিজ্য খাতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। এই সময়ে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের একটি বড় অংশও গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাহিত হয় যা

গ্রামীণ অকৃষি খাতের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা জোরদার করে। উদ্দীপনার অন্য একটি উৎস হলো কৃষি, বিশেষ করে চাল উৎপাদন। বাংলাদেশে মোট চালের উৎপাদন যা ১৯৮০ সালে ১৪-১৫ মিলিয়ন টনের মতো ছিল তা ১৯৯০ সালে ১৮ মিলিয়ন টন, নব্বই'র দশকে ২৩ মিলিয়ন টন এবং বর্তমানে ৩৪ মিলিয়ন টন অতিক্রম করেছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধি গ্রামীণ অকৃষি-খাতের চাহিদা বৃদ্ধির একটি বড় উৎস ছিল।

এই সময়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে প্রধানত গ্রামীণ অকৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন এ খাতে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি ও মজুরি কর্মসংস্থানের বিস্তারে সহায়তা করে। যেহেতু তুলনামূলকভাবে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে মজুরি কর্মসংস্থান গৌণ স্ব-কর্মসংস্থানের তুলনায় অধিক আয় বর্ধনকারী হিসেবে গণ্য হয়, সেহেতু এই ধরনের প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্বায়ন বাংলাদেশের এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে দুই ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে: (১) অকৃষি খাতের চাহিদা জোরদার করার মাধ্যমে এবং (২) উৎপাদন খরচ হ্রাস করার মাধ্যমে। এছাড়া এই সময়ের সমষ্টিক নীতি বিশেষ করে বাণিজ্য ও বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতি উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলোকে আরও সক্রিয় করে তোলে।

বর্তমান বিশেণ্ডষণ থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বায়নের ধনাত্মক সুবিধাগুলো ব্যবহার করে চীন প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও দ্রুতহারে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে। তবে বাংলাদেশ এই সম্ভাবনার কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবে তা নির্ভর করছে সঠিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের উপর যা শুধুমাত্র বিশ্বায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বায়ন অর্থনীতিতে ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম যা একদিকে ক্রমবর্ধমান আয় এবং কর্মসংস্থানের জন্য নতুন সুযোগ বিকশিত করে, অন্যদিকে জীবিকার অনেক বিদ্যমান পথ রূদ্ধ করে দিতে পারে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব অবশ্য এই ধারণা দেয় যে, সামগ্রিক লাভ সাধারণভাবে ক্ষতির তুলনায় বেশি হওয়া উচিত যাতে সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সরকারি নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য স্বল্পকালীন সমন্বয়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা (উদাহরণস্বরূপ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা) যেহেতু সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির উপর এধরনের ক্ষতি সামঞ্জস্যহীনভাবে পতিত হয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নীতির একটি লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে উদ্ভূত সুযোগসমূহ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতার মধ্যে অমিল দূর করার ব্যবস্থা নেয়া। এজন্য দরিদ্রদের সামর্থ্যের কাঠামো পুন:গঠন প্রয়োজন যার জন্য উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, এবং অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদে তাদের অভিগমন বৃদ্ধি প্রয়োজন। অন্যথায় বিশ্বায়নের সম্ভাব্য দারিদ্র্য হ্রাস ক্ষমতার অনেকটাই অবাস্তবায়িত রয়ে যাবে। বাস্তবে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বায়নের ক্ষমতা অনেকটাই নির্ভর করে সম্পদ আহরণ এবং সরকারি ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর, বিশ্বায়নের ক্ষমতার উপর নয়।

২.৪। বাংলাদেশ ও চীনের সামাজিক নীতি

বিগত দশকগুলোতে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চীনের জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশকে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। একই সময়ে কিছু গোষ্ঠী অবশ্য এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে, বিশেষ করে শহরের প্রান্তিক গোষ্ঠী, গ্রামীণ অভিবাসী শ্রমিক

এবং দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী গরিব কৃষক। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র্য এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং ধীর সামাজিক উন্নয়ন বাজার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উঠতি বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে নব্বই'র দশকে চীনে বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নীতিমালায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠন সহজতর হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৯৪৯ সালের বিপণ্ডব পরবর্তী সময়ে চীনে সামাজিক নীতি এবং এর ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক নীতির এই বিবর্তনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সময়কাল (১৯৪৯-১৯৭৮),
- শহর-বান্ধব সংস্কারের সময়কাল (১৯৭৯-১৯৯৯), এবং
- দারিদ্র্য-বান্ধব সামাজিক উন্নয়ন সময়কাল (২০০০-)

প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক নীতিতে উক্ত সময়ের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন কৌশল প্রতিফলিত হয়েছিল। একইভাবে প্রতিটি সময়কালের সামাজিক নীতি ও অর্থনৈতিক কৌশলের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল যাতে অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের অর্জন বাধাগ্রস্ড় না হয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতির এধরনের সংযোগ দারিদ্র্য ও অসমতার উপর ভিন্ন ধরনের প্রভাব রাখতে সম্ভব হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সময়কাল (১৯৪৯-১৯৭৮)

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সময়কালের একটা মূল লক্ষ্য ছিল শহর এলাকায় ভারী শিল্পের বিকাশ। এর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হয় যাতে কৃষির পরিবর্তে ভারী শিল্পের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের সামাজিক নীতি শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন সহায়ক ছিল। মূল লক্ষ্য ছিল 'উৎপাদন প্রথম এবং জীবিকা দ্বিতীয়'। এখানে উলেণ্ডখ করা যায় যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-১৯৮৫) পূর্ববর্তী সময়ে সামাজিক উন্নয়নের ধারণা কখনই প্রত্যক্ষভাবে চীনের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উলেণ্ডখিত হয়নি। অবশ্য এসময়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত। ১৯৫২ সালের শুরু থেকে রেশন পদ্ধতি চালু করা হয় এবং শহরে বসবাসকারীদের জন্য কম খরচে খাদ্য, বাসস্থান ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সামাজিক বিধান চালু হয়। শিল্পায়নের লক্ষ্যে এধরনের সামাজিক নীতি শুধুমাত্র শহরবাসীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যারা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করত তারা এধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

শহর-বান্ধব সংস্কার সময়কাল (১৯৭৯-১৯৯৯)

১৯৭৮ সালের পরে ক্রমবর্ধমান হারে বাজার ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৭৯-১৯৯৯ সময়কালে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল ছিল শিল্পায়ন ও নগরায়ন। এ সময়ে সাফল্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে গ্রহণ করা হয় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি। নীতিসমূহের লক্ষ্য ছিল শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারি

সহায়তায় শহুরে নাগরিকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা, বাসস্থান, যাতায়াত সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা শিল্পায়ন এবং নগরায়নের সাথে জড়িত ছিল।

এই সময়ের সামাজিক নীতি শহর-বান্ধব প্রবৃদ্ধি মডেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। শিল্পায়ন এবং প্রবৃদ্ধি সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়ায় অর্থনীতির দ্রুত বর্ধনশীল খাত ও অঞ্চলসমূহে সরকারি পরিসেবা প্রদানের গ্যারান্টি প্রদান একটি প্রধান নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়। শহরমুখী নীতির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদের তেমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ফলে শহরে দ্রুততর অভিবাসন ও অসমতা বৃদ্ধি পায়। আশি'র দশকে প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হ্রাস পায় তবে শহর ও গ্রাম এলাকার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়।

দারিদ্র্য-বান্ধব সামাজিক উন্নয়ন সময়কাল (২০০০-)

নব্বই'র দশকের শেষভাগে শহর-বান্ধব প্রবৃদ্ধি মডেলের সমস্যাগুলো আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠে এবং গ্রামীণ এলাকার বঞ্চনাগুলো আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও উপকূলবর্তী ও অভ্যন্তরীণ অঞ্চল বিশেষ করে 'পশ্চিম' এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয় স্তর বৈষম্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকার বসবাসকারী কৃষকদের শহরে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান সহজতর হওয়ায় উপকূলবর্তী ও অন্তর্দেশীয় অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৯ সালের মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় সরকার 'পশ্চিম অঞ্চলের উন্নয়ন কৌশল' অনুমোদন করে। এই কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল আয় এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন চালিকা শক্তির বিকাশ সাধন। এক্ষেত্রে সরকারি পরিকল্পনার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ধারণ করা হয়: অবকাঠামো নির্মাণ; পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন; শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামোগত উন্নয়ন; প্রযুক্তি উন্নয়ন শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ; এবং সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ। এজন্য সরকারি নির্দেশনায় প্রয়োজনীয় তহবিল এবং বিনিয়োগ পশ্চিম চীনে স্থানান্তরিত হয় যাতে বৃহৎ প্রকল্প ও উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। বাড়তি গ্রামীণ শ্রমের কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র শহর এবং নগর উন্নয়নের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়। বস্তুত চীনের অভিজ্ঞতা এটা নির্দেশ করে যে, সামাজিক উন্নয়ন একটি সফল ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের মূল উপাদান; দারিদ্র্য এবং অসাম্য হ্রাসের জন্য একটি সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন চ্যালেঞ্জের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারিখাত ভিত্তিক উন্নয়নের পরিবর্তে একদিকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়ন এবং অপরদিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দরিদ্রের ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশে মধ্য আশির দশক থেকে কাঠামোগত সমন্বয় সাধন শুরু হয় নব্বই'র দশকে দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯০ সালের শুরুতে সংস্কার কর্মসূচির ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। নব্বই'র দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা এবং মানব সম্পদ নির্দেশকগুলো আরও উন্নত হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা খাতে বাংলাদেশের অর্জন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ বিশেষ করে ব্যাপক দারিদ্র্য এবং নারীদের প্রতি অব্যাহত সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশের

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (এনজিও) শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন চমকপ্রদ, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এধরনের সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে অসাধারণ উন্নতির ক্ষেত্রে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করে। বস্তুত বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে যে, ব্যাপক দারিদ্র্য সত্ত্বেও সামাজিক উন্নয়ন সূচকে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

২.৫। বাংলাদেশ ও চীনে শহুরে দারিদ্র্য এবং অভিবাসী সমস্যা

বাংলাদেশ ও চীন উভয় দেশেই দ্রুত গতিতে নগরায়ন হয়েছে। চীনে নগরায়নের বার্ষিক হার ১৯৮০ সালের ১৯ শতাংশ থেকে ২০০৬ সালে ৪৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাদেশেও শহরে জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধি হার লক্ষণীয়। অবশ্য বাংলাদেশ ও চীনের শহরের দরিদ্র ও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের তুলনায় কম এবং শহুরে দারিদ্র্য গ্রামীণ দারিদ্র্যের তুলনায় দ্রুতগতিতে কমেছে।[৩] অবশ্য সর্বশেষ খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপে শহর অঞ্চলে দারিদ্র্য এবং আয় বৈষম্য উভয় ক্ষেত্রেই কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় (BBS 2011)। এজন্য দুই ধরনের সীমাবদ্ধতাকে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুততর হারে শহর এলাকায় অভিবাসন। দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধির তুলনায় শহর এলাকার প্রবৃদ্ধির কম সমতা যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করে এবং প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষমতা হ্রাস করে।

প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চীন সঠিক কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি যথার্থ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে চীন অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের জন্য একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করে এবং দারিদ্র্য-বিমোচনে সহায়তা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বৃদ্ধির পক্ষে নীতি গ্রহণ করে (Ping 2003)। কিছু সমীক্ষায় চীনে অভিবাসীদের দারিদ্র্য হার এবং শহুরে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দারিদ্র্য হারের মধ্যে স্বল্প পার্থক্য বিদ্যমান বলে জানা যায়। ২০০০ সালে অভিবাসীদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার ১৫.২ শতাংশ ছিল, যা একই শহর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ছিল ১০.৩ শতাংশ (ADB 2000)।

বাংলাদেশ ও চীন উভয়েরই একটি বৃহৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিক রয়েছে। উভয় দেশেই গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন শহুরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও অভিবাসনের হার প্রভাবিত হয় গ্রাম ও শহর এলাকার মজুরির পার্থক্য এবং শ্রম বাজার পরিস্থিতির দ্বারা। শহর এলাকায় শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি একদিকে শহুরে মজুরি অন্যদিকে অভিবাসন বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের শহর এলাকার শ্রম বাজারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় অভিবাসন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৩ সালে দেশের জিডিপি'তে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান ছিল ৩১.৪ শতাংশ এবং এগুলোতে ১৩৫ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়োজিত ছিল, যা মোট নিয়োজিত শ্রমিকের ২৭.৮ শতাংশ। বাকি ৩৫০ মিলিয়নের বেশি শ্রমিক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল (Zhang 2003)।

[৩] বাংলাদেশের শহর এলাকায় মাথা-গণনা ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার ১৯৯১-৯২ সালে ৪৪.৯ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ২১.৩ শতাংশে হ্রাস পায়। একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস ছিল ৬১.২ শতাংশ থেকে ৩৫.২ শতাংশে (দেখুন BBS 2011)।

চীনের বর্তমান নীতি হচ্ছে কৃষি শ্রমিকের একটি অংশকে অকৃষি খাতে এবং অন্যদেরকে বিশেষায়িত কৃষি ও কৃষি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা যাতে সকল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের শ্রম বাজারের পরিবর্তন সেবা খাত ও তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মসংস্থানের সঙ্গে অনেকটাই জড়িত। অবশ্য বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সারা বছর ব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব। বাংলাদেশে অভিবাসনের ফলে আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস মূলত নির্ভর করে অভিবাসনের প্রকৃতি, অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মূলধন, মানব সম্পদ ও সামাজিক মূলধনের পরিমাণ, এবং সর্বোপরি গন্তব্যস্থলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর। একইভাবে মৌসুমী অভিবাসন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে।

এটা অবশ্য নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশ ও চীন উভয় দেশেই গরিব অভিবাসীরা অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করে। বাংলাদেশের শহর এলাকাতে সবচেয়ে নিম্নমানের আবাসস্থল (যেমন বস্তি) গুলোতে সব থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নতুন অভিবাসীরা বসবাস করে। দরিদ্র অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কর্মসংস্থানের জন্য অনির্ভরযোগ্য ও স্বল্প আয়ের পেশার উপর নির্ভর করে। ফলে বাংলাদেশের দ্র"ত নগরায়নের একটি গুর"ত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ব্যাপকভাবে বস্তি ও অবৈধ বসতির বৃদ্ধি যেখানে সুষ্ঠু জীবনধারণের আবশ্যকীয় সুবিধাসমূহ অনেকাংশে অনুপস্থিত থাকে। এজন্য বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে শহরের ঊর্ধ্বমুখী দারিদ্র্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার অভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী করা হয়।

বাংলাদেশ ও চীনের অভিবাসন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন জীবিকার গুর"ত্বপূর্ণ একটি উপায়; এবং অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুর"ত্বপূর্ণ জীবিকা অর্জনের কৌশল হতে পারে যা একই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বিভিন্নভাবে যেমন শহরে শ্রম প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত উপার্জন করা, আয়ের উৎস বহুমুখী করা এবং বিনিয়োগ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে।

প্রাথমিক ভাবে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হলেও পরবর্তীতে তা লাভজনক হয়ে উঠে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রাখতে পারে। চীনে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমাঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার সঙ্গে বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনের (east-west divide) কিছুটা মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে ২০০০ সালে চীনে গৃহীত 'পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কৌশল' (XiBu Da Kaifa) যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্র"তকরণ, জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এবং জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য গৃহীত হয়েছিল তা থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের দ্র"ততর উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়নে সহায়তা লাভ করতে পারে।

৩। বাংলাদেশ এবং চীনে দারিদ্র্য বিমোচন

চীনে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিগত ২৫ বছর খুবই গুর"ত্বপূর্ণ ছিল। এসময়ে আয় দারিদ্র্য লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে চীন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার (MDGs) ক্ষেত্রে অনেক সফলতা অর্জন করেছে। বিশেষভাবে ১৯৭৮

পরবর্তী সংস্কার পর্বের সময় চীনে ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য হ্রাস লক্ষ করা যায়, যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও দ্র"ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে সম্ভব হয়েছে।

৩.১। আয় দারিদ্র্য প্রবণতা

১৯৭৮ সাল থেকে চীন দারিদ্র্য হ্রাসে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে যা সারা বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। গ্রামীণ এলাকায় পরম দরিদ্রের সংখ্যা ১৯৭৮ সালে ২৫০ মিলিয়ন থেকে ২০০৫ সালে ২৩.৬৫ মিলিয়নে হ্রাস পায় ফলে উক্ত সময়ে দারিদ্র্যের হার ৩০.৭ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ২)। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে দৈনিক ১ ডলারের নিচে বসবাসকারী দরিদ্রের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী ২৭৪ মিলিয়ন হ্রাস পায় যার মধ্যে চীনে এই সংখ্যা ছিল ১৫১ মিলিয়ন যা উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি প্রাপ্ত মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ (Lei 2006)।

সারণি ২

চীনে সরকারি দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে গ্রামীণ দারিদ্র্য

গাল	দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি (%)	দরিদ্রের সংখ্যা (মিলিয়ন)	শহর-গ্রামীণ আয় অনুপাত
১৯৭৮	৩০.৭	২৫০.০	-
১৯৮০	২৭.৬	২১৮.০	২.৪৮
১৯৮৫	১৪.৮	৯৬.০	২.১০
১৯৮৭	১২.০	-	-
১৯৯০	৯.৪	৮৫.০	২.৪৮
১৯৯৫	৭.১	৬৫.০	২.৭৯
২০০০	৩.৪	৩২.১	২.৭৯
২০০৫	২.৫	২৩.৭	৩.৩৪

উৎস: Huang et. al. 2009।

বিগত তিন দশকে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয় ছিল। ১৯৭৮-২০০২ সময়কালে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৮.১ শতাংশ। ২০০৫ সালে চীনের প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি ১৯৮০ সালের মাথাপিছু জিডিপির তুলনায় আটগুণ বেশি ছিল (সারণি ৩)। এই সময়ে দ্র"ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে উলেণ্ডখযোগ্য অবদান রেখেছিল। একই সময়ে দারিদ্র্যের সংখ্যাও দ্র"ত গতিতে কমে, অবকাঠামো এবং সামাজিক সেবা ও দরিদ্রদের জীবিকার পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ৩

চীনের কিছু নির্বাচিত অর্থনৈতিক সূচক

সাল	প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি (২০০১ ইউয়ানে)	বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	জিডিপি'তে কৃষির অবদান (%)	রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১৯৮০	১,৫৭৫	৭.৮	২৯.৯	১৮.১২	-
১৯৮৫	২,৪৪৬	১৩.৩	২৮.২	২৭.৩৫	১.৯৬
১৯৯০	৩,৩০৭	৪.২	২৬.৯	৬২.০৯	৩.৪৯
১৯৯৫	৫,৫৫৫	৯.০	১৯.৮	১৪৮.৭৮	৩৭.৫২

২০০০	৮,০২০	৮.৮	১৪.৮	২৪৯.২০	৪০.৭২
২০০৫	১২,২৪৮	-	১২.৬	৭৬১.৯৫	৬০.৩৩

উৎস: Huang et. al. 2009।

সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি কি পরিমাণ দারিদ্র্য হ্রাসে সমর্থ হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে আয়ের বণ্টনের উপর। এক্ষেত্রে বিগত তিন দশকে চীনে বণ্টনের বৈষম্য অনেকটাই বেড়েছে (সারণি ৪)। একই সময়ে শহর ও গ্রামীণ আয়ের পার্থক্য উলেণ্টখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে (দেখুন সারণি ২)।

বাংলাদেশেও বিগত কয়েক বছরে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৫)। আয় দারিদ্র্য ১৯৯১-১৯৯২ সালে ৫৬.৬ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে এই সময়কালে চরম দারিদ্র্যও যথেষ্ট পরিমাণে কমেছে। অবশ্য চীনের দারিদ্র্য হ্রাসের গতির তুলনায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের সফলতা অনেকটা কম।

সারণি ৪

চীনে ব্যয় বণ্টনের জিনি (Gini) সহগ

স্থান	সাল			
	১৯৭৮	১৯৮৮	১৯৯৭	২০০২
জাতীয়	০.৩০	০.৩৮	০.৩৪	০.৪৫
গ্রামীণ	০.২১	০.৩০	০.৩৪	০.৩৮
শহুরে	০.১৬	০.২৩	০.২৯	০.৩৪

উৎস: Huang et. al. 2009।

সারণি ৫

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি

গাল	সিবিএন পদ্ধতিতে		ডিসিআই পদ্ধতিতে	
	উর্ধ্ব দারিদ্র্য সীমা	নিম্ন দারিদ্র্য সীমা	চরম দারিদ্র্য	হার্ড কোর দারিদ্র্য
২০১০	৩১.৫	১৭.৬	-	-
২০০৫	৪০.০	২৫.১	৪০.৪	১৯.৫
২০০০	৪৮.৯	৩৪.৩	৪৪.৩	২০.০
১৯৯৫-৯৫	৫০.১	৩৫.১	৪৭.৫	২৫.১
১৯৯১-৯২	৫৬.৬	৪১.০	৪৭.৫	২৮.০

উৎস: BBS 2007, 2011।

বাংলাদেশে ক্যালরী ভিত্তিক দারিদ্র্যও হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৫)। এছাড়াও ধারণাভিত্তিক দারিদ্র্য মূল্যায়নও দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতাকে নিশ্চিত করে (সারণি ৬)। অবশ্য দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে চরম দারিদ্র্য বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কিনা এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচন নীতি ওকর্মসূচি প্রণয়নে কতটুকু গুর"ত্ব পেয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

সারণি ৬

বাংলাদেশে ধারণাভিত্তিক দারিদ্র্যের স্ব-মূল্যায়ন

(গ্রামীণ পরিবারসমূহের শতকরা হার)

গাল	সর্বদা ঘাটতি	সাময়িক ঘাটতি	শূন্য উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	উদ্বৃত্ত
২০১০	৪.৪	২৪.১	৩২.৯	৩৮.৬
২০০৪	১১.৬	৩১.৯	৩৩.৪	২৩.১

২০০১	৯.৯	২৬.৩	৪০.৮	২৩.০
১৯৯৫	১৮.০	৩২.২	৩০.৭	১৯.১
১৯৮৯	২৪.০	৫০.০	১৭.৫	৮.৫

উৎস: MOF 2006, 2011।

৩.২। সামাজিক ও পরিবেশগত দারিদ্র্যের প্রবণতা

১৯৭৮ সালের পরে চীনে মানব সম্পদ এবং সামাজিক উন্নয়নে লক্ষণীয় অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। সংস্কার পরবর্তী সময়ে চীনে জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সূচকের ক্ষেত্রে উলেণ্ডখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়-শিক্ষার গড় সময় (১৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে) ১৯৮২ সালে ৪.৬ বৎসর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৭ বৎসর হয়েছে। অশিক্ষিত জনসংখ্যাও ১৯৮২ সালে ২২.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালে ৬.৭ শতাংশ হয়। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৮২ সালে ৩৭.৬ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ২৮.৪ শতাংশে নেমে আসে এবং জন্মকালীন গড় আয়ুর প্রত্যাশা ১৯৮১ সালে ৬৭.৮ বৎসর থেকে ২০০০ সালে ৭১.৪ বৎসরে বৃদ্ধি পায়। চীনে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সূচক মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক নিশ্চিত করে।

সারণি ৭

চীনে নির্বাচিত সামাজিক উন্নয়নের সূচক

সূচক	সাল			
	১৯৭৮/৮০	১৯৯০	১৯৯৭-২০০০	২০০২
বয়স্ক নিরক্ষরতা, %	২২.৮	২০.৭	১৬.৩৬	১০.৭
৭-১৫ শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, %	-	৮২.৯	-	৯৪.৫
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	-	৩২.৯	৩৩.৩	-
মাতৃকালীন মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	-	৮৮.৯	৬১.৯	-
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, বৎসর	৬৯.০	৬৮.৬	৭০.৮	-
জনসংখ্যার নিরাপদ পানিতে অধিগম্যতার অভাব, %	-	২৪.৫	১৩.৩	-
জনসংখ্যার উন্নত স্যানিটারী ব্যবস্থায় অধিগম্যতার অভাব, %	-	১০.০	৭.৭	-
শ্রমিক অভিবাসনের হার, %	-	১.৪	-	১৮.৫
খানায় বিদ্যুৎ এর অধিগম্যতা, %	-	৮৬.০	-	৯৩.৭
গ্রামাঞ্চলে টেলিফোনের অধিগম্যতা, %	-	৪৩.০	-	৯২.২
গ্রামে রাস্তার অধিগম্যতা, %	-	৭৪.০	-	৯৬.৮

উৎস: NBSC 2004 ADB 2000।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ সারণি ৮-এ প্রদান করা হয়েছে। এথেকে দেখা যায় যে, দেশের শিশুদের একটি বিরাট অংশ অপুষ্টির শিকার। এটি নিম্ন ওজন (৪১ শতাংশ) এবং বিকাশ ব্যাহত শিশু (৪৩ শতাংশ) উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপরন্ত গ্রামীণ শিশুরা শহরের শিশুদের চেয়ে বেশি বঞ্চিত। পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৯৯০ সালে ১৫১ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৭৩ হয়েছে। নিরাপদ পানীয় জলের অধিগম্যতা বর্তমান অবস্থায় সন্তোষজনক (৯৭.৮ শতাংশ)। অবশ্য আর্সেনিক দূষণ এখন একটি বড় হুমকির সৃষ্টি করেছে। স্যানেটারী টয়লেটের অধিগম্যতা এখনও অনেকটা কম; মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫৪ শতাংশ বর্তমানে এই সুবিধা ভোগ করছে।

যদিও সাক্ষরতার হার ১৯৯০ সালে শতকরা ৩২.৪ ভাগ থেকে উন্নীত হয়ে ২০১০ সালে ৫৭.৯ ভাগ হয়েছে, তবুও এটা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। বিগত দশকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে; ১৯৯০ সালে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার ছিল শতকরা ৬০ ভাগ, যা ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৫ ভাগ।

৩.৩। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

চীনে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়: (১) কৃষকদের সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা (১৯৭৮ এর পূর্ববর্তী সময়); (২) সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কৃষির বাণিজ্য শর্তের উন্নতিসাধন (১৯৭৮ এবং ১৯৮৪ সময়কাল); এবং (৩) টার্গেট কর্মসূচির সাথে চুইয়ে-পড়া (Trickle down) উন্নয়ন কৌশলের সমন্বয় সাধন (১৯৮৫ এর পরবর্তী সময়কাল) (দেখুন ADB 2000)।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে চীনের লক্ষ্য ছিল একটি শোষণমুক্ত ও শ্রেণি বৈষম্যহীন আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কম উৎপাদনশীলতা ও অপর্যাপ্ত সম্পদের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকার একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যাতে প্রাপ্ত সম্পদ ও উৎপাদন সকল নাগরিকের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন নিশ্চিত হতে পারে। এই পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন প্রধানত অর্জিত হয় নিম্নে বর্ণিত মাধ্যম দ্বারা:

- ভূমিতে কৃষকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি : চীন দেশব্যাপী ভূমি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে যাতে গ্রামীণ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থায় আপেক্ষিক সমতা অর্জিত হয়।
- কৃষকদের সম্পদের অভিগম্যতার উন্নতি সাধন : ১৯৫০ সাল থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকার দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। ফলে উক্ত সময়কালে রাস্তার দৈর্ঘ্য নয় গুণ এবং সেচের আওতাধীন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
- গ্রামীণ ঋণ সমবায়ের জাতীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তির উন্নতি সাধন করা হয়।
- এই সময়ে চীন দেশব্যাপী ৪০,০০০ কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার অফিস প্রতিষ্ঠা করে যাতে কৃষকদের প্রযুক্তিগত সেবা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় ।

সারণি ৮

বাংলাদেশে নির্বাচিত সামাজিক উন্নয়ন, ১৯৯০-২০১০

সূচক		সাল				
		১৯৯০	১৯৯৫	২০০০	২০০৩/০৫	২০০৭/১০
যথার্থ ওজনের	গ্রামীণ	-	-	৫৩.৯	৪৮.৮	৪৩.০
থেকে কম ওজন	শহুরে	-	-	৪৩.১	৪২.২	৩৩.৪
(underweight)	জাতীয়	৬৮	৫৬.৩	৫০.৮	৪৭.৫	৪১.০
	গ্রামীণ	-	-	৫১.১	৪৪.৩	৪৫.০
% বৃদ্ধি ব্যাহত	শহুরে	-	-	৪০.৪	৩৭.৬	৩৬.৪
(stunted), %	জাতীয়	৬৪	৫৪.৬	৪৮.০	৪৩	৪৩.২
মানব দারিদ্র্য সূচক (HPI)		-	৪৭.৪	৪০.৩	৩৬.৪	-

মোট গর্ভধারণের হার		৪.৩	৩.৫	৩.০	২.৫৬	২.৩
৫ এর নিচে শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ এ)		১৫১	১২৫	৯২	৮৮	৭৩
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ এ)		৯৪	৭১	৫৭	৫৩.৩	৪১
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০)		৪৭৮	৪৪৭	৪০০	৩৯১	-
নিরাপদ পানির অধিগম্যতা (%)		৮৯	৯৭	৯৭.৫	৯৭.৪	৯৭.৮
স্যানেটারী টয়লেটের অধিগম্যতা (%)		২৯	৩৮	৪৩.৪	৫৩.২	৫৪.১
সাক্ষরতার হার	পুরুষ	৩৮.৯	-	৪৯.৫	৫২.৮	৬১.১২
(৭+)	নারী	২৫.৫	-	৪০.১	৪৪.৫	৫৪.৮০
	উভয়	৩২.৪	-	৪৪.৯	৪৮.৮	৫৭.৯১
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	ছেলে	৬০	৮২	৮১	৮১.১	৮২.৬১
নীট ভর্তির হার	মেয়ে	৫৯	৮২	৮৩	৮৪.৪	৮৬.৯৯
(%)	উভয়	৬০	৮২	৮২	৮২.৮	৮৪.৭৫
গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের হার (%)		৪০	৪৯	৫২	৫৩.৪	৫৫.৮
টিকা (DPT 3) প্রদানের হার ১২-২৩ মাস		৬২	৬৯	৭৪.৪	৮১.০	৯০.০
তীব্র অপুষ্টি (এম	ছেলে	-	-	৩.৬	৩.৬	-
ইউএসি <১২.৫	মেয়ে	-	-	৫.৭	৪.৮	-
সে:মি)	উভয়	১১	১১	৪.৭	৪.২	-
১২-৫৯ মাস						
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তির হার, %		৩১.৪৭	৪৩.২৪	৪৫.৩৯	৪৭.৭৫	-
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের অনুপাত		-	১.১০৩	১.০৩৬	১.১০৯৮	-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের অনুপাত		১.২৩	১.০৯৬	০.৮৬৬	-	-

উৎস: BDHS 2007, HDR 2009, BBS/UNICEF 2010, GED 2009।

- কৃষকদের মৌলিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি সাধন : এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১.৬ গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮ গুণ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন ৫০,০০০ শহরকেন্দ্রিক হাসপাতাল ও ৬০০,০০০ এরও বেশি গ্রাম্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে।
- একটি সমাজভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন : এই গ্রামীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যারা বেকার বা অক্ষম তাদের জন্য প্রাথমিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এইসব ব্যবস্থার ফলে এই সময়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য প্রায় ৮০ শতাংশ থেকে কমে ৫০ শতাংশে দাঁড়ায় (ADB 2000)।

১৯৭৮ সালে চীন গ্রামীণ অঞ্চলগুলোর জন্য গৃহস্থালি দায়িত্ব ব্যবস্থা (household responsibility system) চালু করে যার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের জমি ও শ্রম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করার অধিকার লাভ

করে। এর ফলে কৃষকরা বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়, ব্যবস্থাপনা উন্নত হয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উলেণ্ঢখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় প্রধানত নিম্নে বর্ণিত কারণে:

- ধারাবাহিক উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : ১৯৭৮-২০০২ সময়ে চীনে গড় মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.১ শতাংশ, যার মানে প্রতি ৮.৬ বৎসরে মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণ হওয়া।
- গ্রামীণ শ্রমশক্তিকে অকৃষি কর্মকাে নিয়োজিতকরণ : এই সময়কালে বেশি সংখ্যক শ্রমিককে গ্রামীণ ও শহর কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে এধরনের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৭৮ সালে ২৮ মিলিয়ন থেকে ২০০১ সালে ১৩১ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়।
- দ্র ত নগরায়ন : এই সময়ে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে অভিবাসন গ্রহণ করে। ১৯৮২ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রায় ২০৬ মিলিয়ন লোক গ্রাম থেকে শহরে গমন করে। এই সংখ্যা ঐ সময়ের মোট শহরবাসীর প্রায় ৪৫ শতাংশ। অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই ছিল গ্রামীণ শ্রমজীবী যারা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরবাসী হয়।
- রপ্তানিমুখী নীতিমালা বাস্তবায়ন : সংস্কার কর্মসূচি এবং মুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের ফলে ১৯৭৮ সাল থেকে চীনের রপ্তানি দ্র ত গতিতে বৃদ্ধি পেতে শুর করে। বিশেষত শ্রমঘন পণ্যের রপ্তানি অতি দ্র ত বৃদ্ধি পায়, যা কর্মসংস্থানের দ্র ত বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু চীন দ্র ত বৈদেশিক বিনিয়োগ সফলভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ করে।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন : সংস্কার পরবর্তী সময়ে জনগণের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সূচকসমূহ দ্র তগতিতে উন্নতি লাভ করে যা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চীনে বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দ্র ত বৃদ্ধি পেতে শুর করে। এজন্য চীন সরকার টার্গেট-ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করে :

- প্রাথমিকভাবে সমষ্টিক অর্থনীতির সহায়তা ছাড়াই আঞ্চলিক টার্গেট ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুর হয়।
- সমষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন করে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকা এবং দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এজন্য কৃষকদের স্থানভিত্তিক অভিবাসনের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হয় এবং শ্রমঘন শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।
- সরকার অবশিষ্ট গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের পরবর্তীতে সরকার টার্গেটিং এর জন্য দরিদ্র অঞ্চলের পরিবর্তে দরিদ্র গ্রাম এবং দরিদ্র খানাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করে। একই সময়ে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে অর্থায়ন উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

চীনের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। 'দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নেতৃস্থানীয় গ্র"প' (এলজিপিআর) এবং এর নির্বাহী সংস্থা 'দরিদ্র এলাকার উন্নয়ন অফিস' যার নেটওয়ার্ক কাউন্টি ও টাউনশীপ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র কর্মসূচি এলজিপিআরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশেষ করে এলজিপিআর ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কর্মসূচিতে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ত দৃঢ়তর করার মাধ্যমে এলজিপিআর এর নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

অপরদিকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে গ্রামীণ অবকাঠামো কার্যক্রম (Rural Public Works Program) একটি গুর"ত্বপূর্ণ নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং আয় বর্ধনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সরকারি সংস্থা এবং এনজিও এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সব কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা। এছাড়া আরও অন্যান্য কর্মসূচি রয়েছে যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), ভিজিডি, গ্রামীণ অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং অন্যান্য কর্মসূচি যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রসার মূলক কর্মসূচি রয়েছে যেমন শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ, বিশেষ বৃত্তি ও অর্থ সহায়তা, এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি যেগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখে। ইদানিং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সফল করতে সরকারের মোট বাজেটের প্রায় ৫৮ শতাংশ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে) ব্যয়িত হচ্ছে।

সরকার দরিদ্র মহিলা, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে প্রায় ৮৭টি (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি যেমন: কাবিখা, ভিজিডি এবং ভিজিএফ। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সীমিত পরিসরে কাজ করে যা দেশের বিরাজমান বিরাট মাত্রার চরম দারিদ্র্য এবং প্রান্তিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা এবং নিরাপদ বেষ্টনীর সুষম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সমষ্টিক জাতীয় নীতি অনুপস্থিত। এজন্য বেশিরভাগ সামাজিক বেষ্টনীর মাত্রা, ধরন এবং কৌশল নিয়মিত পরিবর্তিত হয় বিশেষত সরকার পরিবর্তনের সাথে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বিদ্যমান যা এগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ইতিবাচক দিক থাকলেও এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু দুর্বলতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: অপর্যাপ্ত সম্পদ বণ্টন, সীমিত পরিসর, অনুপযুক্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রহণযোগ্য অপচয় (Leakage)।

এছাড়া এধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঠিক টার্গেটিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করা। এজন্য অধিকতর সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কারণ

চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের, তাদের তেমন কোনো সম্পদ নেই যা তাদেরকে সহায়তা করার 'প্রবেশ বিন্দু' (entry point) হিসেবে কাজ করতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য চরম দরিদ্র গোষ্ঠীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে স্থান-কাল এবং গ্রুপভিত্তিক উদ্ভাবনী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৪। উপসংহার: চীনের দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

চীনের দারিদ্র্য বিমোচন সফলতা অর্জিত হয়েছে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে। এছাড়া চীনের দারিদ্র্য মূলত একটি গ্রামীণ সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান ছিল।[৭] একারণে গ্রামীণ এলাকার প্রবৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে অভিবাস কিছুটা আংশিকভাবে হলেও চীনের দারিদ্র্য বিমোচনে উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা রাখে। চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চালিকা শক্তি কাজ করেছে যার মধ্যে রয়েছে চলমান সংস্কার, কাঠামোগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর। কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে বাজার ব্যবস্থা, কৃষি থেকে শিল্প ও সেবা খাত এবং বদ্ধ অর্থনীতি থেকে বৈশ্বিক সমন্বিত অর্থনীতিতে রূপান্তর। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি সম্পদ হস্তান্তর ও সম্পদ গঠনের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি,অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কৌশলগত বিনিয়োগ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

চীনে বিরাজমান সমষ্ঠিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য ফলপ্রসূ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিরামহীন প্রচেষ্টা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীকে সফল করতে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করে। তদুপরি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী সম্পদ আহরণ ক্ষমতা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দারিদ্র্য দূরীকরণে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একত্রে কার্য সম্পাদন দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন মাত্রা যোগ করে। দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনাগুলোর আওতায় শিক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষণের সুযোগ থাকায় সংশিণ্ঢষ্ঠ নীতি নির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা নিজস্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচিগুলোকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ '৮-৭ পরিকল্পনা' বাস্তবায়নকালে ভর্তুকি ঋণ কর্মসূচির তুলনামূলক দুর্বল দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাবের প্রেক্ষিতে সরকার বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন 'দক্ষিণ-পশ্চিম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প' (এস ডাবিণ্ঢউপিআরপি) চালু করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

চীনের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সফল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ

[৭] ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে চীনে শহুরে দারিদ্র্যের হার ছিল মাত্র ০.৩ শতাংশ, যেখানে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ২৮ শতাংশ বলে অনুমিত হয়।

চীনের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সুবিধা বয়ে আনে। তবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ঐ সকল এলাকা এবং খানাকে সহায়তা প্রদান করে যারা বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে সরাসরি সুবিধা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়। ১৯৭৯-এর পরবর্তী প্রাথমিক সংস্কারকালীন সময়ে চীনের প্রবৃদ্ধি দরিদ্র-বান্ধব ছিল। এ সময়ে সুষম ভূমি বণ্টন, পলণ্ডী এলাকায় অধিকতর দক্ষতার সাথে ভূমির ব্যবহার, কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি এবং শহর ও পলণ্ডী এলাকায় খামার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রসারের লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

টেকসই ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার অধিক রাজস্ব আয়ে সক্ষম হয় যা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অর্থায়নে সহায়তা করে, নতুন অকৃষিখাত ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটায় এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন উৎসাহিত করে যেহেতু শহর এলাকায় অধিকতর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শহরমুখী অভিবাসনের ফলে কৃষি-শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়, কৃষি জমির একত্রিকরণ সহজতর হয় এবং উচ্চতর কৃষি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারসমূহের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য বিমোচন ব্যতীত অপ্রতুল কার্যকর চাহিদা এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন ব্যতিরেকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসমতা (যা মূলত শহর এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য) বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ড় করে।

- টার্গেটিং এবং দরিদ্রদের অংশগ্রহণ

চীনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এলাকা ভিত্তিক টার্গেটিং পদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং তা খানা ভিত্তিক টাগেটিং এর সঙ্গে পরিপূরক হতে হবে। যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের অর্থ বণ্টন প্রক্রিয়া, কর্মসূচি নির্ধারণ এবং ফলাফল মূল্যায়নে সম্পৃক্ত করা না যায় তাহলে তাদের চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ সম্ভবপর হবে না এবং তাদের প্রান্তিক অবস্থানের পরিবর্তন করা দুরূহ হবে।

- এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সঙ্গে খানাভিত্তিক ব্যবস্থার সম্পৃক্তকরণ

এলাকা ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য পরিপূরক খানাভিত্তিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর জন্য খানাভিত্তিক টার্গেটিং সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচির সামগ্রিক টার্গেটিং ফলপ্রসূ হয়।

- দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে মৌলিক বীমা ব্যবস্থা

মৌলিক বীমা ব্যবস্থা দরিদ্র পরিবারগুলোকে ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে নি:স্বকরণ প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এবং অদরিদ্র পরিবারকে দরিদ্র হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অসুস্থতা ও পঙ্গুত্ব গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ। উন্নয়নকামী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ছাড়াও গ্রামীণ এলাকার জন্য মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক ও মৌলিক স্বাস্থ্য বীমা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চীনে গ্রামীণ চিকিৎসা সমবায় ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে খানার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে দক্ষ ও সফল করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা জর"রি। এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে দারিদ্র্যকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করাও সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

- মানব উন্নয়নে গুর"ত্ব

চীনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, মানব উন্নয়ন বিশেষ করে দীর্ঘকালীন দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। যদিও চীনে প্রাথমিক অবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে মানব সম্পদের উপর যথাযথ গুর"ত্ব দেয়া হয়নি বরং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ দারিদ্র্য বিমোচনে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (দেখুন Fan, Zhang and Zhang 2002)। দরিদ্র কৃষকদের সুস্বাস্থ্য এবং দক্ষতা প্রয়োজন যাতে তারা সঠিক শস্য উৎপাদন করতে পারে, উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

- স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ বরাদ্দ প্রদান

সেবাপ্রদান, সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এজন্য দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন যাতে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

- কার্যকর সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ

চীনের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপনের জন্য শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধন ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়ন একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে।

- গ্রামীণ ও শহর এলকার মধ্যে বিভক্তি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে যে বিভক্তি বিরাজ করে তা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নশীল অর্থনীতির বিকাশমান সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্ঠি করে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন যদি না করা হয় তবে তা গ্রামীণ ও শহরের মধ্যে অভিবাসন, সরকারি সেবা প্রদান এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্ড় করে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ইত্যাদি পদক্ষেপ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসুবিধাসমূহ দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এজন্য প্রয়োজন একটি সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি যা প্রণয়নে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ একান্ত বাঞ্চনীয়।

- অভিবাসনের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন

গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে অভিবাসন ও রেমিট্যান্স গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে অনেক দরিদ্র ব্যক্তির অভিবাসন করার অক্ষমতা এই ভূমিকাকে সঙ্কুচিত করে। এছাড়াও অভিবাসনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতিও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যেমন গ্রামীণ যুবকদের শিক্ষার উপর বিরূপ প্রভাব, গ্রামীণ সহমর্মিতার অবক্ষয় ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা।

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে কৃষিখাত থেকে উৎপন্ন প্রবৃদ্ধি অকৃষিখাতে উৎপন্ন প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ (World Bank 2008)। কৃষিখাতে দ্র"ত প্রবৃদ্ধি চীনের গ্রামীণ দারিদ্র্য প্রশমনে মূল ভূমিকা রাখে। অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ ও চীন উভয়ের ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তন গুর"ত্বপূর্ণ নিয়ামক। উভয় দেশেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা সীমিত। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার অভিযোজন ক্ষমতা দুর্বল যা জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে এবং তাদেরকে গভীরতর দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত করে।

এছাড়া কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ চীন ও বাংলাদেশে বিদ্যমান। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে চীনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। সফলতার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অভিযোজন কৌশলগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল গ্রহণ এবং দরিদ্র শ্রেণির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিজস্ব ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

ADB (2000): *PRC Poverty Reduction Approaches and Experience,* Asian Development Bank, Manila.

BBS (2007): *Report on Household Income and Expenditure Survey 2005,* Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

–––(2011): *Report on Household Income and Expenditure Survey 2010,* Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS/UNICEF (2010): *Progotir Pathay 2009*, Bangladesh Bureau of Statistics and UNICEF, Dhaka.

BDHS (2007): *Bangladesh Demographic and Health Survey 2007,* NIPORT, Mitra and Associates, and Macro International, Dhaka.

Chen, S. and Y. Wang (2001): *China's Growth and Poverty Reduction: Trends between 1990 and 1999,* Development Research Group and Economic Policy and Poverty Reduction Division, World Bank and World Bank Institute, Washington D.C.

Fan, S., L. Zhang, and X. Zhang (2002): *Growth, Inequality, and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments,* IFPRI Research Report No. 125, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Gao, H. (2001): *Study on Poverty Reduction and Development Planning,* China Financial and Economic Press, Beijing.

GED (2009): *The Millennium Development Goals – Bangladesh Progress Report 2009*, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Heckman, J. (2003): 'China's Investment in Human Capital', *Economic Development and Cultural Change:* 795-804.

Huang, J., Q. Zhang, and S. Rozelle (2009): 'Determinants of Rural Poverty Reduction and Pro-Poor Economic Growth in China', Chapter 14 in J. von Braun, R. Hill and R. Pandya-Lorch (eds.) *The Poorest and Hungry: Assessments, Analyses and Actions,* International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Khondker, B. H. and M. K. Mujeri (2006): 'Globalisation-Poverty Interactions in Bangladesh' in M. Bussolo and J.I. Round (eds.) *Globalisation and Poverty: Channels and Policy Responses,* Routledge/Warwick Studies in Globalisation, London and New York: Routledge.

Khondker, B. H., M. K. Mujeri and S. Raihan (2008): 'Welfare and Poverty Impacts of Tariff Reforms in Bangladesh: A General Equilibrium Approach,' Chapter 4 in Cockburn, J., B. Decaluwe, and V. Robichaud (eds.) *Trade Liberalization and Poverty: A CGE Analysis of the 1990s Experience in Africa and Asia,* PEP Research Network, Canada.

Lei, Z. (2006): *Basic Experiences of China's Poverty Reduction*, International Poverty Reduction Center in China, Beijing.

Li, B. and D. Piachaud (2004): "Poverty and Inequality and Social Policy in China," CASE Paper 87, London School of Economics, London.

MOF (2006): *Bangladesh Economic Review 2005,* Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

−−−(2011): *Bangladesh Economic Review 2010,* Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

NBSC (2004): *Poverty Statistics in China,* Rural Poverty Organization of National Bureau of Statistics, China, Beijing.

Osmani, S. R. (2005): *The Impact of Globalization on Poverty in Bangladesh,* Working Paper No. 65, Policy Integration Department, National Policy Group, International Labor office, Geneva.

Ravallion, M. (2002): *Externalities in Rural Development: Evidence for China,* Policy Research Working Paper 2879, Poverty Team, Development Research Group, World Bank, Washington D.C.

Ravallion, M. (2009): "Are There Lessons for Africa from China's Success Against Poverty?, *World Development*, 37(2), 2009.

World Bank (2001): *China: Overcoming Rural Poverty,* Rural Development and Natural Resources Unit, East Asia and Pacific Region, World Bank, Washington D.C.

−−−(2008): *World Development Report: Agriculture for Development*, World Bank, Washington D.C.

−−−(2009): *From Poor Areas to Poor People: China's Evolving Poverty Reduction Agenda-An Assessment of Poverty and Inequality in China,* Poverty Reduction and Economic Management Department, East Asia and Pacific Region, World Bank, Washington D.C.

Zhang, Z. (2003): *Rural-Urban Migration in China – What Do We Know and What Do We Need to Know?* China Center for Economic Research, Beijing University, Beijing.

Zhao, Y. (2001): *Causes and Consequences of Return Migration: Recent Evidence from China,* Working Paper No.E2001010, China Center for Economic Research, Beijing University, Beijing.